বাঙালির ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার সংকট

মফিজুর রহমান রুন্নু

বাঙালির ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার সংকট

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য যাঁরা জীবন দান করেছেন তাঁদের প্রতি।

ভূমিকা

আত্মপরিচয় ও জাতীয়তার বিভ্রমে আমাদের সামাজিক সংহতি ক্রমশ ভঙ্গুর হয়েছে। এটা জোরালো হয়েছে দেশের ক্ষমতার রাজনীতির অংশীদারেরা নিজ স্বার্থে যে জাতীয়তার বয়ান তৈরি করেছেন এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিকে উসকে দিয়েছেন সেই অশুভ প্রয়াসে। 'বাঙালি' বা 'বাংলাদেশি' উভয় পরিচয়ের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে মুসলমানত্বের বিষয়টি সবার ওপরে বসিয়ে দেওয়ার ফল হিসেবে আমাদের সামনের পথটি ইতোমধ্যেই পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। এর থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনেই আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আবহমানকালের অসাম্প্রদায়িক সামাজিক ঐতিহ্যের দিকে নজর ফেরানো দরকার। এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সামাজিক ঐকমত্য ও সমৃদ্ধির দিশা। জাতীয় স্বার্থ ও ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্য ছাড়া আমাদের অগ্রযাত্রা পথ হারিয়ে ফেলবে।

বাঙালি একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে তার ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষ রূপ পেয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল একটা সময়ে বাংলাভাষী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধনে পূর্বের রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বজ্র ইত্যাদি স্বতন্ত্র জনপদগুলো ইতিহাসের এক পর্যায়ে বাংলা বা বাংলা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হয়। এই অঞ্চলের অধিবাসী যারা বাঙালি হয়ে উঠেছিল তাদের একক কোনো নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ছিল না। তাদের শরীরে

অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনাসহ নানা জাতির রক্তধারা প্রবহমান। এই হিসেবে বাঙালি একটি সংকর জাতি। শুধু নানা রক্তধারা নয়, বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যেও পাওয়া যাবে নানা জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদান। স্বাভাবিক নিয়মেই নানা বিদেশি-বিভাষী শব্দ ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে। ভাষা ও সংস্কৃতি কোনো সুচিন্তিত বিশেষ পরিকল্পনায় জন্ম নেয় না। তা গড়ে ওঠে নদীর স্বাভাবিক স্রোতধারার মতোই সাবলীল গতিতে। সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমন্বয়ধর্মিতা। বাঙালির সংস্কৃতিও এভাবে নানা উপাদান আত্মস্থ করে ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে। ভাষা, মনন, লোকবিশ্বাস, লোকদর্শন, আচার, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভাবসাধনা, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র ইত্যাদি মিলেমিশে একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে বাঙালির সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষ অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনাসহ নানা জাত ও বর্ণের মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি আমরা। এ সংযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হওয়ার নয়। বাঙালিত্বের ভিত্তি গড়ে উঠেছে এই সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যের জমিনেই। এর মধ্যেই কেটে গেছে আমাদের অগ্রজ পুরুষদের জীবন।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এসেছে। তার নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার আমাদের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু বাঙালিত্বের ভিত্তিকে দুর্বল করেনি। বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনই বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ ধর্ম। তা গোটা সংস্কৃতির বিকল্প নয়। সংস্কৃতি হলো মূল ভিত্তি। ধর্ম যার যার বিশ্বাস ও ভক্তির জায়গা। এ কারণে আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্মাচারের মধ্যে বিরোধ ঘটার কথা নয়, তা ঘটেওনি। শত শত বছর ধর্মবিশ্বাসের ভিন্নতা নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাশাপাশি সমাজবদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন। বাঙালির লোকসংস্কৃতি, লোককবিতা ও গানে অসাম্প্রদায়িক মানবতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে। বাঙালির রক্তধারাতে এই অসাম্প্রদায়িক সহনশীলতার চেতনা প্রবহমান রয়েছে।

নিজেদের শিকড়কে অস্বীকার করে বাঁচা যায় না। আমাদের সকলের ঠিকানা প্রোথিত রয়েছে এই জীবনমুখী সংস্কৃতির সরস জমিনে। ধর্ম ভিন্ন হতে পারে, রাষ্ট্রও ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমাদের আত্মপরিচয় মিলবে চিরাচরিত ভাষা ও সংস্কৃতির মাঝে। কিন্তু আবহমানকালের এই গৌরবময়

ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশ খুবই সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের উদার অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থানকে গুরুত্বহীন করে তুলে ধর্ম পরিচয়কেই সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে— আমরা বাঙালি নাকি মুসলমান? পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কয়েক দশক বাঙালি মুসলমানকে এই ধর্মের ঘোরের মধ্যে রাখা হয়েছিল। তাতে এই দেশের সাধারণ বাঙালির কোনো লাভ হয়নি। আবারও সেই পুরানো ঘোর সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পোশাক, আচার-উৎসব-পার্বণ সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিটাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা হচ্ছে। বাঙালির সংস্কৃতিকে 'হিন্দুয়ানি' সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাও আছে। 'বাঙালি' জাতীয়তা 'বাংলাদেশি' জাতীয়তার পর এখন 'মুসলিম' জাতীয়তার অশুভ প্রবণতা ইতোমধ্যে দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করেছে। জাতিকে বিভাজন করার অশুভ আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক স্বার্থ এর সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের এই ভ্রান্তির পথ ও আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্য জোরদার হয়েছিল তা থেকে বিচ্যুত হলে গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশের সকল নাগরিকের স্বার্থ সংশয়হীনভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভাষা-সংস্কৃতির বন্ধন, সুস্পষ্ট জাতীয় পরিচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন একটি উন্নততর সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করাই আমার এই বইটি লেখার নেপথ্য প্রণোদনা।

যেসব বন্ধু চলমান সংকট নিয়ে আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন বইটি পড়ে আশা করি তাঁরা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন। এই বইটিও প্রকাশ করছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা *কথাপ্রকাশ*। প্রকাশক জসিম ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

–মফিজুর রহমান রুন্নু

সূচি

অধ্যায় এক
উৎস সন্ধান ১৩
অধ্যায় দুই
ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বয় এবং বাঙালি জীবন ২৯
অধ্যায় তিন
বাঙালির ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ১১৯
অধ্যায় চার
বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ ১৬৬
অধ্যায় পাঁচ
বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ : জাতীয়তাবাদের নতুন সংস্করণ ১৮৮
অধ্যায় ছয়
পথ অন্বেষা ২০৬
গ্রন্থপঞ্জি ২১৯

অধ্যায় এক

উৎস সন্ধান

প্রত্যেকটি জাতির পিছনের একটি ইতিহাস থাকে। ইতিহাস জানা দরকার হয় নিজেদের অস্তিত্ব ও উৎসের সন্ধানেই। কখন-কীভাবে বাঙালি হিসেবে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেটা জানার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকেই জানতে পারব। মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের বিকল্প নেই। একই সমাজের মানুষের মধ্যে আবেগ-অনুভূতি, প্রয়োজন, নিরাপত্তা ও ভাষার ক্ষেত্রে এক ধরনের ঐকমত্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় একত্রে বসবাস করতে করতে তাদের মধ্যকার বোঝাপড়া বা সমঝোতার ক্ষেত্রটি তৈরি হয়। যে কোনো জাতির অস্তিত্বের জন্য এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

যে কোনো জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গাত্রবর্ণ, উচ্চতা, করোটির আকৃতি, চুল, নাক, অক্ষিপুট, ঠোঁট, মুখাবয়ব ইত্যাদিতে মিল বা অমিল দুটোই থাকতে পারে। অমিল থাকে তখনই যখন ভিন্ন রক্তধারা ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে একটি জাতির আবির্ভাব ঘটে। শারীরিক বৈশিষ্ট্য বংশধারার বিষয়, মানুষ তা জন্মগতভাবে লাভ করে। কিন্তু মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য নৃতাত্ত্বিক উৎস অপেক্ষা আঞ্চলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবিকা, সমাজজীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে সর্বাধিক। বাঙালি জাতির স্বরূপ সন্ধানে এসব বিষয় বিবেচনায় রাখা দরকার।

ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বাংলাভাষী মানুষের বাস। এই অঞ্চলের একটি অংশে আছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ, আমরা যে দেশে বাস করি। বাংলাদেশেই সংখ্যাধিক্য বাঙালির বসবাস। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এরপরেই সর্বাধিক বাঙালির বসবাস। এছাড়া ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালির বসবাস। বাংলাভাষী এই সমগ্র এলাকার অধিকাংশ ভূভাগই পলি দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চল দিয়েই গঙ্গা (পদ্মা), মেঘনা, যমুনা (ব্রহ্মপুত্র)সহ অসংখ্য নদনদী প্রবাহিত হচ্ছে। এসব নদনদী হিমালয় গাত্রের পলি বহন করে এখনো বঙ্গোপসাগরে সঞ্চয় করে চলেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূভাগ অপেক্ষাকৃত নবীন পলিতে গঠিত। এখনো এই প্রক্রিয়া চলমান আছে। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি, গাজীপুর অঞ্চলের মধুপুর ও ভাওয়াল গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় প্লেসটোসিন যুগের পুরানো মোটা দানাযুক্ত মৃত্তিকায় গঠিত। এছাড়া বৃহত্তর সিলেট, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়গুলো টারশিয়ারি যুগে গড়ে ওঠা হিমালয় পর্বতের বর্ধিত অংশ। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, যা দ্বিতীয় বৃহৎ বাংলাভাষী অঞ্চল। বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গের উত্তরেও হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উপকূলীয় সমভূমি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ—দুই পাশেই উঁচু পার্বত্যভূমি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভূভাগ উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মালভূমি রয়েছে। উত্তরাংশে গঙ্গার অববাহিকা ও গঙ্গা-ভাগীরথীর সংযোগস্থলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলজুড়ে রয়েছে সমভূমি। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আছে গঙ্গার বদ্বীপ ও উপকূলীয় সমভূমি। এই অঞ্চল ও মালভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম রাঢ়। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পার্বত্যভূমি এবং পশ্চিমাংশের মূলভূমি বাদ দিলে গোটা বাংলা অঞ্চলটাই হলো বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সমভূমি। তবে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের ভূ-ভাগ নতুন পলিগঠিত এবং সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল।

বাংলাভাষী সমগ্র অঞ্চলটির উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চল প্রাচীন মৃত্তিকায় গঠিত। প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও

পাথরের হাতিয়ারগুলো যা পাওয়া গেছে তা এ অঞ্চলেই। সে তুলনায় অন্য অঞ্চলগুলোতে পাওয়া নিদর্শনগুলোর অধিকাংশই পোড়ামাটির। বিস্তীর্ণ ভূভাগ পলি গঠিত হওয়ায় পাথরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বেশ কম। যা পাওয়া গেছে তা থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ যাকে আমরা বাংলা অঞ্চল বা বৃহত্তর বাংলাদেশ বলে চিনি তা পুরানো কালে কোনো একক প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল না। এই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে বেশ কয়েকটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। যেমন—রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বজ্র, তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি। প্রাচীন লেখাগুলোতে এই জনপদগুলোর যে নাম পাওয়া যায় সেগুলোকে মূলত কোম বা Tribe-এর নাম মনে করা হয়। নীহাররঞ্জন রায় জানাচ্ছেন এগুলো—"জনপদ বা স্থানের নাম নয়—কোমের নাম, যথা—বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ পুণ্ড্রাঃ, গৌড়াঃ অর্থাৎ বঙ্গজনাঃ, গৌড়জনাঃ, পুণ্ড্রজনাঃ, রাঢ়া জনাঃ, বঙ্গ-গৌড়-পুণ্ড্র-রাঢ় কোম (Tribe অর্থে)।"[১]

অবশ্য পরবর্তীকালে এসব অঞ্চলের নামকরণ হয় ওই অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারী কোমগুলোর নামেই। বাংলা অঞ্চলের এই কোমগুলোর নামকরণের পিছনে ভারতীয় মিথেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মহাভারতের কয়েকটি স্থানে এই সব জনপদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্বে দীর্ঘতমস নামে এক অন্ধ ঋষির গল্প পাওয়া যায়। তাঁর পাঁচ পুত্রের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। তারা পরবর্তীকালে যে পৃথক জনপদগুলোতে বাস করত সে জনপদের নাম হয় তাদের নাম অনুসারে।[২] এই জনপদগুলো পৃথক হলেও ক্রমেই এ অঞ্চলগুলোর মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সংযোগ গভীর হতে থাকে। পরবর্তীকালে এ কারণেই এসব অঞ্চলের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক এলাকা বা স্বতন্ত্র দেশ গঠন সম্ভব হয়।

এখনকার বাংলাদেশের মধ্যভাগে বঙ্গ নামে একটি জনপদ ছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই নাম থেকেই বাঙ্গালা, বাঙ্গলা বা বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি হয়। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাঙ্গালা বা বাঙলা নামের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—প্রাচীন

রাজারা নিচু জমিতে, পাহাড়ের পাদদেশে মাটি উঁচু করে ১০ ফুট উঁচু ও ২০ ফুট চওড়া মাটির ঢিবি তৈরি করত। এগুলোকে বলা হতো 'আল্'। 'বঙ্গ' নামের সঙ্গে এই আল্ প্রত্যয় যোগ হয়ে 'বাঙ্গাল বা 'বাঙ্গালা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[৩] এই ব্যাখ্যাকে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে নদীমাতৃক বাংলাদেশে বহু যুগ আগে থেকেই কৃষিজমিতে পানি ধরে রাখা এবং বন্যা ও জোয়ারের পানি থেকে ফসল রক্ষার প্রয়োজনে কৃষকরা জমিতে আল্ তৈরি করত। সুতরাং বাংলাদেশ বলতে সে সময় পূর্ব বঙ্গকেই বোঝানো হতো।

> "মানিকচন্দ্র রাজার গানের 'ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি' পদে অনুমান হয়, ভাটি ও বঙ্গাল বা বাঙ্গালদেশ এক সময়ে প্রায় সমার্থকই ছিল। কিন্তু বঙ্গাল বা বাঙ্গালদেশের কেন্দ্রস্থান বোধ হয় ছিল পূর্ব-বঙ্গে।"[৪]

গবেষক ও লেখক গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন যে—ষোলো শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখাতেও 'বাঙ্গাল' শব্দটি পাওয়া যায় এবং এই বাঙ্গাল বলতে পূর্ববঙ্গের মানুষকেই বোঝানো হতো। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র রায় (অষ্টাদশ শতকের কবি) তার লেখায় 'বাঙ্গালা' বলতে বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন এবং এই অঞ্চলের অধিবাসীকেই তিনি 'বাঙ্গালি' আখ্যায়িত করেছেন।[৫]

এখনো পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা পূর্ববঙ্গের মানুষদের 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করে। এই অভিধা বরং এদেশের মানুষের জন্য গৌরবের। বঙ্গাল বা বাঙ্গাল দেশের সীমা সম্প্রসারিত হতে থাকে। পূর্ববঙ্গের সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলও বাঙ্গাল বা বাংলাদেশ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এর সঙ্গে যখন প্রাচীন 'বাঙলা' ভাষা সাধারণ কথ্যভাষা হিসেবে বৃহত্তর অঞ্চলে গৃহীত হয় তখন সমগ্র অঞ্চলটিই বাংলা অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়।

> 'বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্য, আসামের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা, ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া জেলার বৃহদংশ, ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া ও ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা, ধানবাদ ও সিংভূম জেলার বাংলাভাষী অঞ্চল এবং ওড়িশার বালেশ্বর জেলার কিছু এলাকা নিয়ে এই দেশ।'[৬]